ধারাবাহিক

শেষ পারানির কড়ি

অনুপ ঘোষাল

পূর্বকথা ঃ ফুলির আত্মহত্যার কারণ নিয়ে পুলিশ মাথা ঘামায়নি। অস্বাভাবিক মৃত্যুর কেস লিখে ফাইল বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু বুদ্ধিমতী ছাত্রীর এ ভাবে মৃত্যুতে সদানন্দর অগোচরে গ্রামে শুরু হয়েছে এই আদর্শ শিক্ষকের চরিত্রে কাদা লাগানোর প্রয়াস। ফুলির বাবা বেণু সদানন্দর বাড়ি বয়ে এসে দাবি করল, ওই সন্ধ্যায় ফুলি সদানন্দের সঙ্গেই ছিল। চাপ দিয়ে দশ হাজার টাকা আদায় করল। এ দিকে পরদিন স্কুলের দেওয়ালে পোস্টার, চরিত্রহীন হেড মাস্টারের পদত্যাগ চাই।

১৬

ন'টা কুড়িপঁচিশ মিনিট নাগাদ সদানন্দ যখন স্কুলের গেটে পৌঁছে সব পোস্টারগুলো দেখতে পেল, তখন রাখহরিবাবু এবং দু'তিন জন শিক্ষক ছাড়া কেউই আসেননি। ছাত্রছাত্রীদের তো ওই পোস্টারগুলো দেখার প্রশ্নই ওঠে না। সকলে আসার আগেই ওই কুৎসাভরা কাগজগুলো তুলে ফেলা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও স্কুলের আবহটা কেমন বদলে গিয়েছে। ক্লার্ক, টাইপিস্ট, ক্যাশিয়ার – কেউ এইচ.এম–র ঘরে ঢুকে কাজের কথা বলারও সাহস পাচ্ছে না। খুব দরকারে সসংকোচে কেউ আসছে, কাগজপত্রে সইসাবুদ করিয়ে নিয়েই যেন পালাচ্ছে। সব মিলে এক অস্বস্তিকর পরিবেশ।

স্কুল ছুটির পর ঘরে ফিরে সেদিন সদানন্দর আর সান্ধ্যভ্রমণে বেরোতে ইচ্ছে করছিল না। বিছানায় চুপচাপ শুয়েছিল। স্কুলের ব্যাপারটা নিয়ে কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। কীভাবে এই উদ্ভট পরিস্থিতিটা সামাল দেওয়া যায়! এই জঘন্য নোংরামির পিছনে কে বা কারা আছে, নিশ্চিতভাবে বলার মতো প্রমাণ এখনও হাতে নেই।

গ্রামের মানুষের সঙ্গে এই বছরখানেকের মধ্যেই সদানন্দ চমৎকারভাবে মিশে গিয়েছিল। অনুভব করছিল, সকলে তাকে সম্মান করে। পছন্দ করে। এখন পর্যন্ত এই বেণু ছাড়া কেউ–ই তার সঙ্গে সরাসরি খারাপ ব্যবহার করেনি। বরং রাখহরিবাবু আজ স্কুলে এসে পরিস্থিতিটা যেভাবে সামলালেন, সেটাও খুব বাস্তবসম্মত। মনে হচ্ছিল, তিনি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল। হঠকারিতা তিনি সদানন্দকে করতে দেননি।

সেদিন সন্ধেবেলা সদানন্দের ঘরে হঠাৎ হাজির হল ফকির মনসুর মিঞা। চোখেমুখে চাপা উত্তেজনা। সদানন্দ আগে থেকেই ভারাক্রান্ত ছিল। তবু জোর করে ঠোঁটে হাসি এঁকে ফকিরসাহেবকে ঘরের ভিতর হাত ধরে নিয়ে এল। চেয়ার টেনে বসতে দিল। মিঞাও হাসার চেষ্টা করছে। পারছে না। চায়ের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করল সবিনয়ে। সদানন্দ হঠাৎ বুঝে উঠতে পারল না, ভর সন্ধেয় তার কাছে কেন ফকিরের হঠাৎ এমন আসা।

মনসুর চেয়ারে বসে আবার উঠল। বারান্দার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে চারদিক দেখে এসে বলল, স্যার আপনার বিরুদ্ধে গ্রামে একটা গভীর চক্রান্ত হচ্ছে।

সদানন্দ চমকে উঠল, চক্রান্ত?

মনসুরের গলা নামল, হ্যাঁ, চক্রান্ত। আপনাকে সাবধান করতে এলাম।

সদানন্দ গুম মেরে গেল। এমন দুঃসময়ে আবার নতুন করে ষড়যন্ত্র কিসের! কৌতূহলী হয়ে বলল, ব্যাপারটা খুলে বলুন তো ফকিরসাহেব।

মনসুর একটু ইতস্তত করে বলল, আমার কাছে কাজে–অকাজে গ্রামের অনেক লোকই তো যায়। ক'দিন ধরেই একটা কানাঘুসো শুনছিলাম। আজ বটতলায় বেণুর দোকানে চা খেতে গিয়ে নিজের কানে যা শুনে ফেললাম ...

– কী শুনলেন?

– আমাকে দেখেই ওরা চুপ করে গেল, কিন্তু কিছুটা হলেও আমি শুনে ফেলেছি। আসলে প্রথমেই আমাকে ঠিক লক্ষ করেনি। যারা এ সব নিয়ে ঘোঁট পাকাচ্ছে তাদের সকলকেই আপনি চেনেন। ওই দোকানেই ওঠাবসা। বংশী, রমাপদ, হরিহর, অনিল – এরা সব। সকলেই তো আপনার খুব ভক্ত বলেই জানি।

– কী বলছে ওরা?

– আর কী! বেণুর মেয়েটাকে আপনার সঙ্গে জড়িয়ে ...

– অ্যাঁ! বংশীরা? তো, বেণু কিছু বলছে না?

– হ্যাঁ। বলছে। আর বেণুর শেষ কথাটা শুনে তো আমি থ।

সদানন্দ স্তম্ভিত হয়ে শুধোয়, বেণু কী বলছে?

–কী আর বলবে! আপনি নাকি মাত্র দশ হাজার টাকা দিয়ে বেণুর মুখ বন্ধ করতে চাইছেন। আমার শুনে মাথা গরম হয়ে গেল। আপনি বেণুকে দেবেন ঘুষ, এটা হয়? রাগের মাথায় ওদের যা মুখে এল শুনিয়ে চলে এলাম।

– বলছেন কী!

– ভাবতে পারিনি, লোকগুলো একজোট হয়ে আমার সঙ্গেও ঝামেলা করতে আসবে!

– ঝামেলা মানে?

– আমাকে জাত তুলে অকথ্য গালাগাল। আপনাকে নাকি স্কুল থেকে তাড়াবেই। আমারও আখড়া তুলে দেবে। বাইরের লোকের নোংরামি গ্রামের লোক সহ্য করবে না।

সদানন্দ কথা বলার শক্তিই হারিয়ে ফেলেছে যেন। কোনও রকমে বলল, বেণুর মুখেও এ সব কথা শুনলেন?

– আপনি কি সত্যিই ওকে ডেকে আজ একটা দশ হাজার টাকার চেক দিয়েছেন? ও নাকি ব্যাংক থেকে ভাঙিয়ে নিয়ে এসেছে। সকলে ওকে ধমকাচ্ছিল, দশে রাজি হলি কেন? আপনি টাকাফাকা ওকে দিয়েছেন সত্যি?

সদানন্দ এই প্রশ্নের কী জবাব দেবে বুঝতে পারছে না। প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। গলার স্বর যতটা সম্ভব সংযত করে বলল, সেটা তো আমাকে প্রায় ব্ল্যাকমেল করে নিয়ে গেল!

মনসুর বলল, টাকাটা ওকে দিয়ে ভুল করেছেন। লোকটা বউয়ের ধামাধরা একটা আস্ত শয়তান। ওর বউটা ... যাক গে, শুনেছেন কিছু?

সদানন্দ বেণুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও ওর পরিবার সম্পর্কে আগ্রহ দেখায়নি কখনও। কদাচিৎ ওদের বাড়িতে গিয়েছে। মেয়েটা পড়াশোনায় ভালো ছিল বলে তাকে একটু সাহায্য করত, উৎসাহ দিত।

মনসুর মিঞা এক দারুণ খবর দিল। বিপত্নীক রাখহরি মণ্ডলের বহুদিন ধরে যাতায়াত আছে বেণুদের বাড়িতে। টগরের সঙ্গে তাঁর অবৈধ সম্পর্কের ব্যাপারটা অসুস্থ এবং স্ট্রেণ বেণু ইদানীং মেনেই নিয়েছিল। রাখহরির সাহায্য ও পরামর্শেই চলে বেণুদের পরিবার। কোনও অভাব নেই। যখন তখন রাখহরি মাস্টারের আসাযাওয়া ওদের বাড়িতে। ফুলি শুধু প্রতিবাদ করত, সে রুখে দাঁড়িয়েছিল ক'দিন আগে। টগরের ছোট ছেলেটাকে নাকি দেখতে অন্যরকম। ফুটফুটে ফরসা। হুবহু রাখহরিবাবুর ছেলেবেলার বসানো মুখ। বেণুকে টগর ভয় দেখায়, ওই ছেলের হাত ধরে যে কোনও দিন সে রাখহরি মাস্টারের বাড়ি চলে যাবে, চা–ওয়ালার ঘর করবে না। বেণু ভয়ে কাঁটা।

সদানন্দ সব শুনে আকাশ থেকে পড়ল। এখন বুঝতে পারছে যে মানুষটা রোজ প্রেয়ার শেষ না হলে স্কুলের ভিতর পা রাখেন না, সেই লোক স্কুলে শুরু হওয়ার আধ ঘণ্টা আগেই আজ সেখানে পৌঁছে গেলেন কেন? মজা দেখতে হাজির হয়েছিলেন আর কি! সেখানে গিয়ে হেডমাস্টারের বিধ্বস্ত অবস্থা দেখে সমব্যথীর অভিনয় করলেন মাত্র। সদানন্দর আর বুঝতে বাকি থাকল না, নাটের গুরুটি কে!

মনসুর ফকির আরও জানাল, গ্রামের সাধারণ মানুষ কিন্তু এই কুৎসা বিশ্বাস করেনি। ফুলির সঙ্গে ভাটুর সম্পর্কের কথাটা অনেকেই জানত। ওদের দু'জনকে এখানে ওখানে দেখা যেত প্রায়ই। মাত্র কয়েকজন লোক ব্যাপারটা নিয়ে জলঘোলা করার চেষ্টা করছে এবং তাদের মাতিয়ে তুলছেন রাখহরি মণ্ডল।

মনসুর যাওয়ার সময় সদানন্দকে একটু সাবধানে থাকার পরামর্শ দিল। আশ্বাস দিয়ে বলল, মাস্টারমশাই যেন ভেঙে না পড়েন। বেণুকে ধমক দিয়ে এসেছে আজ, এরপরেও যদি লোকটা বাড়াবাড়ি করে তা হলে ফকিরও গ্রামের সাধারণ মানুষকে এক করে এই কুৎসা ও চক্রান্ত প্রতিরোধ করতে নামবে। সদানন্দর মতো ভালোমানুষকে বিব্রত হতে দেবে না।

এই মুহূর্তে সদানন্দ মনসুর মিঞাকে কী বলবে বা নিজেই কী করবে, কিছু ভেবে পাচ্ছে না। কোথাকার জল কোথায় গড়িয়ে চলেছে। সমস্ত ব্যাপারটা তার কাছে বিরক্তিকর মনে হলেও নির্বিকার থাকার উপায় নেই।